

বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে

উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার

গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ

(১৪৯৫-১৮৭৩)

তন্ময় ভট্টাচার্য

বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে

উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার

গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ

(১৪৯৫ - ১৮৭৩)

তন্ময় ভট্টাচার্য
প্রণীত

Banglar Kabbyo o Manchitre Uttar 24 Pargana o Hooghly Jelar
Ganga-Tiroborti Jonopod

(Localities on the bank of the Ganges of North 24 Parganas and Hooghly districts
in verse and maps of Bengal)
A book of Essays by Tanmoy Bhattacharjee

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২৩
গ্রন্থস্বত্ব: তন্ময় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ
আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN: 978-81-967863-2-8

প্রকাশক
আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
মাস্তুল, ১৪, শান্তিনগর রোড, ভদ্রকালী, হুগলি ৭১২২৩২
+৯১ ৮২৪০৪৮৭১২৫

পরিবেশক
মান্দাস, ১৮, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক
সাইবার গ্রাফিক্স
৩২/১, নৈনান পাড়া লেন, কলকাতা ৭০০ ০৩৬

₹ ১৩৯৯ টাকা

$ ২০ আমেরিকান ডলার

নদী যাদের কোনোদিন একা হতে দেয়নি...

নদীপথের স্পষ্ট ও ধূসর ইতিকথা

অস্ট্রেলিয় লেখক জেমস কোয়ান (James Cowan) 'আধুনিক সভ্য' পৃথিবীর একমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নানাভাবে যাচাই করেন। এ পৃথিবীর আধুনিক সভ্য-বাসিন্দারা এখন যেভাবে এই ভূ-ভাগকে দেখেন, ভৌগোলিকতার অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখায় সুনির্দিষ্ট করেন, আকাশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ওপর কৃত্রিম-উপগ্রহের উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য আশ্চর্য-কুশলতায় নজরদারি করেন, গুগল ম্যাপের নির্দিষ্টতায় লোকেশন-শেয়ারের তাৎক্ষণিকতায় চাঁদমারি ভেদ-করার কথা ভাবেন তার বাইরে আরেক পৃথিবী আছে। আছে বাইরের ভৌগোলিকতায় ও মনের ভেতরে—মনের পৃথিবী অনেক সময় বাইরের ভূগোলকে আচ্ছন্ন করে। সেই মনোবাসনা বিজড়িত ভূগোল মিথ্যে নয়। কোয়ানের *অ্যা ম্যাপমেকার'স ড্রিম* (২০০৭) সে-কথা বলতে চেয়েছিল। এই উপন্যাস এক মানচিত্র-নির্মাতার মানচিত্র নির্মাণ করতে না-পারার আখ্যান। ষোড়শ শতাব্দীর ভেনিস। দ্বীপবর্তী নির্জন মঠের গৃহে থাকেন ফ্রা মাওরো (Fra Mauro)। ভাবেন তিনি এই বিশ্বচরাচরের যাবতীয় প্রাকৃতিক অস্তিত্বের মানচিত্র তৈরি করবেন। তাঁর সেই পরিকল্পনার কথা জেনে তাঁর কাছে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে উপস্থিত হন নানা দেশের নানা পর্যটক। মাওরো শোনেন তাঁদের কথা—কিন্তু সেই আখ্যান-অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার উপযুক্ত মানচিত্র শেষ অবধি তাঁর অধরাই থেকে যায়। কোয়ানের উপন্যাস যেন আলোকায়নের সুনির্দিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বকে প্রশ্ন করে।

জানার তথ্যগত বাসনা আর সেই তথ্যগত বাসনার বাইরে থেকে যাওয়া পৃথিবী এই দুয়ের টানা-পড়ার আততি (anxiety) মানুষের 'অনিবার্য' সঙ্গী। এই অনিবার্যতার সঙ্গে প্রযুক্তি-প্রকৌশলের তাল-মিলে যে উপসর্গগুলি নতুন যুগধর্মের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত হল ইদানীং তারই সূত্রে 'anthropocene' শব্দটি গণপরিসরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ-যুগের নানা বিপদ-আপদ। শিল্পবিপ্লবোত্তর বাণিজ্যবাসনাবহুল পাশ্চাত্যের ঢেউ এসে লাগল প্রাচ্যের নানা দেশে। সেই তরীতে কেবল বাণিজ্যজীবীরা নয় এলেন ধর্মজীবীরাও। আর সেই বাণিজ্যজীবী ও ধর্মজীবীদের ছোঁয়া লেগে ক্রমশই বদলে যেতে লাগল জলপথের চেহারা—তাঁরা এই জলপথের সুনির্দিষ্টতাকে মানচিত্রের অবয়বে প্রতিফলিত করে নতুন বিদ্যাবিষয়ের অধিকারী করে তুললেন বঙ্গদেশীয়দের, ভারতবর্ষীয়দের। বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় শব্দদুটি ব্যবহার করছি বটে কিন্তু এখন এই শব্দদুটি যে

কল্পনার ঐক্য আমাদের মনে আভাসিত করে সেই কল্পনার ঐক্য তখন ছিল না, ক্রমে জেগে উঠেছিল।

বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ এই বইটির বিষয়। 'কাব্য' ও 'মানচিত্র' এই শব্দদুটি ভিন্ন দুই চেতনার অধিকরণ। প্রাগাধুনিক পর্বের কাব্যে যখন এই দুই অঞ্চলের জনপদের কথা উচ্চারিত তখন সেই উচ্চারণে ভূগোলের তথ্যের সঙ্গে মনের সত্য-কল্পনা অনেক সময়েই মিলে-মিশে গেছে। মঙ্গলকাব্যের 'ত্রিবেণী' কি কেবল স্থাননাম? দেহসাধনার ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যধারায় এই ত্রিবেণী তো তিন-নাড়ির সঙ্গমস্থল। নিম্নগ যা-কিছু, এই সঙ্গমে তা সাধক দেহে ধৃত হয়। তারপর সেই সাধকের উজানযাত্রা। বস্তুগত ভূগোলে দেহভূগোল মিলে-মিশে গেল। চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার সঙ্গে সাধকের উজানযাত্রার কল্পনা দুই নিয়েই মঙ্গলকাব্যের বাণিজ্যপথ। এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ও মনে রাখা দরকার। মঙ্গলকাব্যের কবিদের নদীপথের অভিজ্ঞতা ছিল না। নদীর গতিপথের বদল, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার এসব নানা কারণাকারণে বাণিজ্যযাত্রার ওঠা-পড়া। যা অভিজ্ঞতায় নেই তা কাব্যে ধারণ করতে গেলে কল্পনার সঙ্গে কাল্পনিকতার (imagination আর fancy) স্বাভাবিক রাজযোটক ঘটাতেন কবি। এছাড়া মুদ্রণপূর্ব কাব্যে তো প্রক্ষেপের প্রবেশ ছিলই। আসর জমে গেলে কথক-গায়েনরা তালিকা প্রশস্ত করতেন। খাদ্য-তালিকা, তীর্থনামের তালিকা, জনপদের তালিকা বিস্তৃত হয়। আসরের শ্রোতারা চেনা নাম-ধাম শুনতে পেয়ে খুশি। সেখানে সে স্থাননাম সম্ভব কি না সে-বিচার গৌণ। সমুদ্রবর্ণনায় কল্পনা আরও লাগামছাড়া। বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আকবারবাদশাহের সমকালীন নদীপথ ও সমুদ্র-সঙ্গমের চিত্র আঁকেন তখন তাঁর সেই রোম্যান্টিকতা, পাশ্চাত্য সাহিত্যপড়া রোম্যান্টিকতা, ভূগোলের বাস্তবতাকে কখনো অতিক্রম করে না। বঙ্কিমচন্দ্র মানেন স্বভাবানুকরণ আর স্বভাবাতিরিক্ত দু-য়ের যথাযথ সহযোগে সাহিত্য তৈরি হয়। এই স্বভাবাতিরিক্ত কল্পনা (imagination) কাল্পনিকতা (fancy) নয়। ফরাসি-বিপ্লবোত্তর পাশ্চাত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর কোলরিজ যে রোম্যান্টিক ইস্তাহার রচনা করছেন তাতে কল্পনার অনুষঙ্গে লঘু-কাল্পনিকতা নিবার্য, নিষিদ্ধ। বঙ্কিমের উপন্যাসে নবকুমার সমুদ্র দেখে বিস্মিত, যা দেখেছে জন্ম-জন্মান্তরে ভুলবে না সে এই অঙ্গীকারে দৃঢ়। এই বিস্ময়বোধ ও সৌন্দর্যবোধ কিন্তু উপন্যাসের ভূগোল-কথনকে ধূসর করেনি। পাঠক ভোলাবার জন্য ভূগোলের ভুল ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিম করেন না। অন্যদিকে মঙ্গলকাব্যের কবিদের সমুদ্রবিবরণে জোঁকদহের উপস্থিতি—ঠিক যেমন আরব্যরজনীর গল্পে চুম্বক-পাহাড়ে জাহাজ বিপর্যস্ত হত তেমনি সমুদ্রবর্তী রাশি রাশি জোঁক জাহাজযাত্রা বিপন্ন করে তুলত। কম্পাসের আবিষ্কার, দূরবীনের প্রয়োগ, মানচিত্রের ব্যবহার—নৌবাণিজ্যে আর উপনিবেশ নির্মাণে পাশ্চাত্যকে ক্রমে শক্তিশালী করে তোলে। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে *দিগ্‌দর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইউরোপের বিবরণ'-এর অন্তর্গত 'জাহাজ ব্যবসায়' অংশে লেখা হল,

> এই জাহাজ ব্যবসায় বৃদ্ধি হওয়াতে তাবৎ পৃথিবী ইউরোপীয়েরদের চক্ষুর গোচর হইল। ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীর আকার ও তাহার নানা দেশের সংস্থান ও বসতির নিরূপণ পর্য্যন্তও

ইউরোপীয় লোকেরা জানিত না। এবং ইউরোপীয় লোকেরা স্বদেশে বদ্ধরূপ থাকিয়া অন্য২ দেশের বিষয় যখন যে কোন পথিক যাহা কহিত সে সত্য কিম্বা মিথ্যা হইক তাহাই বিশ্বাস করিত। জাহাজ ব্যবসায়দ্বারা মনুষ্যেরা পৃথিবীর সত্য আকার জানিল ও পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত তাহারা গমন করিল এবং প্রত্যেক দেশের স্থান ও নিরূপণ নিশ্চয় করিল। (দিগদর্শন, আগস্ত ১৮১৮)

এই যে সত্য, নিরূপণ নিশ্চয় এর উপায় মানচিত্র। কাব্যের থেকে অধিকরণ হিসেবে তার গোত্র পৃথক। এর অর্থ এই নয় পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শপূর্ব ভারতবর্ষ 'নিরূপণ নিশ্চয়' করত না। করত। তবে সে উপায়-পদ্ধতি পৃথক। ভারত মহাসাগরের নৌবাণিজ্য ও রাজনীতি নিয়ে অশীন দাশগুপ্তের ঐতিহাসিক সন্দর্ভগুলিতে সেই সব উপায়ের প্রসঙ্গ আছে। অশীন দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'কিন্তু পর্তুগিজ জাহাজ দেখে, তাদের নৌচালনার যন্ত্রপাতি দেখে, ভারত সাগরের নাবিকেরা মোটেও বিস্মিত হলেন না। ভারত সাগরের শ্রেষ্ঠ নাবিক ইবন মজিদ বোধকরি ভাস্কো ডা গামাকে পথ দেখিয়ে আফ্রিকার মালিন্দী বন্দর থেকে ভারতবর্ষের কালিকটে নিয়ে আসেন।' (*ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য ও রাজনীতি ১৫০০-১৮০০*)

তন্ময় ভট্টাচার্যের বইতে ফিরি। তিনি 'কাব্য' ও 'মানচিত্র' এই দুই অধিকরণের সাহায্যে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা তীরবর্তী জনপদগুলির 'ইতিহাস' রচনা করতে চেয়েছেন। তাঁর আগ্রহ স্থানীয় জনপদের প্রতি—স্থানীয় জনপদের ইতিহাস ও ইতিকথা লিখতে চাওয়ার মধ্যে আত্মপরিচয় সন্ধানী মন কাজ করে যায়। আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানে কৌতূহল যেমন থাকে, তেমন থাকে মায়া। সেই মায়া আর কৌতূহল যুক্তির অনুসারী, তবে কাহিনিকেও ফেলতে চায় না। সহজিয়া -সাধকেরা রঙ্গ করে বলতেন 'সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে।' এই বইটিতে তন্ময় যতটা সম্ভব প্রশ্নশীল মনস্কতায় উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলির জনপদগুলির এখনকার চেহারার সঙ্গে পূর্বকথনের রূপ কীভাবে মিলছে বা মিলছে না তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গদ্য সাবলীল, পাঠকের আগ্রহকে ধরে রাখে। বিদ্যাচর্চার গণপরিসরে এ-জাতীয় গ্রন্থের আয়োজন যত হয় তত ভালো। তিনি পরিশ্রম করে প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যের জগৎ অধ্যয়ন করেছেন, মানচিত্র দেখেছেন, প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা পাঠকের আদর পাবে আশাকরি।

বিশ্বজিৎ রায়
(বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী)

প্রাক্‌কথন

'ছলাৎছল ছলাৎছল ছলাৎছল
ঘাটের কাছে গল্প বলে নদীর জল'—
লিখেছিলেন কবীর সুমন। তবে শুধু ঘাটের কাছেই নয়, কান পাতলে জনপদের আলো-হাওয়াতেও শোনা যায় নদীর কথা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রবহমান যে নদী, তার ভাঁড়ারে গল্পের কমতি নেই। জনপদ সেসবের সাক্ষী। যখন কোনো নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে জনপদ, ইতিহাসের পাতায় অঙ্গাঙ্গী হয়ে যায় উভয়েই। হুগলি নদীর ক্ষেত্রেও সে-কথা প্রযোজ্য, যে-নদীকে চলতি কথায় *গঙ্গা* বলতেই অভ্যস্ত আমরা। দক্ষিণবঙ্গে হুগলি নদীর তীর ঘেঁষে জন্ম নিয়েছে অজস্র জনপদ, হারিয়েও গেছে প্রচুর। সে-সমস্ত জনপদের খোঁজই আমাদের লক্ষ্য।

এ-বইয়ের বিষয়বস্তু ঠিক কী? সহজে বলতে গেলে, এক যাত্রাপথের কথা বলে এই বই। পাঠককে সওয়ারি করে ডিঙা বা জাহাজে, তারপর, রওয়ানা দেয় হুগলি নদীর পথ ধরে। এ-বই এক টাইমমেশিন, যা আপনাকে নিয়ে যাবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। পাঁচটি শতকের জলপথে যাতায়াত করবেন আপনি, দেখবেন, কীভাবে বদলে যাচ্ছে দু-পাড়ের এলাকাগুলি। পথনির্দেশক হিসেবে হাতে থাকবে একাধিক বাংলা কাব্য, সঙ্গে ইউরোপীয়দের আঁকা বিভিন্ন মানচিত্র। মনে-মনে বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করবেন অতীতের। অবাক-বিস্ময়ে ভাববেন, এখনকার সঙ্গে কতই-না ফারাক সেকালের!

বইটির নাম 'বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ'। দীর্ঘ এই নামের ভিতরেই লুকিয়ে পরিচিতি। এতদঞ্চলে নদীটির প্রকৃত নাম *ভাগীরথী*। ইউরোপীয়দের আগমনের পর, ক্রমে ভাগীরথীর দক্ষিণভাগ *হুগলি নদী* নামে পরিচিত হয়। হুগলি নদীর একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়েই আমাদের আলোচনা, যার বাঁ-দিকে হুগলি জেলা ও ডানদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ত্রিবেণী থেকে শুরু হয়ে, কলকাতার উপকণ্ঠে বরানগরে ফুরিয়েছে মূল আলোচনাপথ। ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্টের তথ্য অনুযায়ী, আলোচ্য নদীপথের দৈর্ঘ্য ৪৭.৪৬৮ কিলোমিটার। হুগলি জেলার ত্রিবেণী থেকে উত্তরপাড়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহর থেকে

বরানগর—গঙ্গার তীর-ঘেঁষা জনপদগুলিই বইটির মেরুদণ্ড। প্রসঙ্গ অনুযায়ী, বিভিন্ন সময়ে গুরুত্ব পেয়েছে হাওড়া, কলকাতা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার একাধিক জনপদও।

ত্রিবেণী থেকেই কেন শুরু হল আলোচনা? কাব্য ও মানচিত্র মিলিয়ে এর সহজ উত্তর দেওয়া যায়। বাংলা কাব্যগুলিতে বণিকদের যাত্রা মূলত *উজানীনগর* (চণ্ডীমঙ্গল; একটি মতানুসারে, পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত) বা *চম্পানগর* ওরফে *চম্পকনগরী* (মনসামঙ্গল; এর অবস্থানও তর্কসাপেক্ষ, একটি মতানুসারে পূর্ব বর্ধমানে) থেকে শুরু হলেও, সমুদ্র পর্যন্ত পথের প্রথম ও প্রধান নোঙর ত্রিবেণীতে। অন্যদিকে, সমুদ্রপথে হুগলি নদীতে ঢুকে, ইউরোপীয় বণিকদেরও উত্তরের প্রাথমিক সীমা ছিল প্রথমে ত্রিবেণীর নিকটবর্তী সপ্তগ্রাম, পরবর্তীকালে হুগলি। ফলে, কাব্য ও মানচিত্র উভয়ের তুলনা করলে, ত্রিবেণী ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলি হয়ে ওঠে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আরেক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ কলকাতা। নদী-তীরবর্তী ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির মধ্যে কালক্রমে সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এই মহানগরী। এছাড়াও ত্রিবেণী-কলকাতার মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে একাধিক শহর ও গ্রাম, যা বিভিন্ন সময় বাংলার ইতিহাস গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। ফলে, হুগলি নদীতীরের সবচেয়ে স্পন্দমান অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় আলোচ্য ভূখণ্ডটিকেই। এছাড়া কাশিমবাজার, ফলতা, হিজলি প্রভৃতি জনপদও বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয়দের হাত ধরে।

এই বই আঞ্চলিক ইতিহাসের নয়। তবে কাব্য ও মানচিত্রের আলোকে একটি জনপদকে চেনার চেষ্টা—আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার এ-ও এক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বইকি! যদিও কোনো জনপদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত জানার জন্য বইটিতে উঁকি দিলে, পাঠক হতাশ হবেন। কাব্য-সমালোচনা কিংবা বাংলার ইউরোপীয় উপনিবেশ-সংক্রান্ত আকরগ্রন্থও নয় এটি। ইউরোপীয় জাতিগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, বিস্তার ইত্যাদি প্রসঙ্গ আমরা এড়িয়ে গেছি সচেতনভাবেই। আমাদের লক্ষ্য বৃহত্তর প্রেক্ষিত থেকে ইতিহাসকে ফিরে দেখা। আর সেখানেই লুকিয়ে এ-বইয়ের প্রয়োজনীয়তা। আধুনিককালে, যখন ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে সর্বস্তরে, তখন বাংলার ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানোর গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারি না কেউই। কলকাতাকেই সর্বোত্তম বলে দাবির যে প্রচ্ছন্ন উন্নাসিকতা চলে চারপাশে, তার বিরুদ্ধেও অবস্থান করে এই বই। কলকাতার আগে, বা কলকাতার সমসাময়িক আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছিল কাছেপিঠেই; এমনকী, কলকাতা যখন সাধারণ এক গ্রামমাত্র, সপ্তগ্রাম-হুগলি হয়ে উঠেছিল বাংলার অন্যতম আন্তর্জাতিক বন্দর ও জনপদ। কাব্য ও মানচিত্রের হাত ধরে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার নদী-তীরবর্তী জনপদগুলির বিস্মৃত অতীতে আলোকপাত করতে চেয়েছি আমরা। কলকাতা এখানে চালক নয়, সঙ্গী মাত্র।

১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সরণি ধরা পড়েছে এ-বইয়ে। ১৪৯৫ সালে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর *মনসামঙ্গল কাব্য* থেকে শুরু, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে এইচ. এল. থুইলারের

মানচিত্রে ইতি। তবে ইতিহাসের সব রেখাই কুয়াশাচ্ছন্ন। বিপ্রদাসের কাব্যটির সাল নির্দিষ্টভাবে জানা যায় বলেই সেটি প্রথমে গ্রহণ করা হয়েছে; যদিও অন্য দু-একটি কাব্য তারও আগেকার বলে অনুমান করা হয়। সেই কাব্যগুলিও আলোচিত হয়েছে যথাস্থানে। অন্যদিকে, থুইলারের মানচিত্রটিরও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের *সুরধুনী কাব্য*-এর দ্বিতীয় ভাগ (১৮৭৬), অথচ দীনবন্ধু প্রয়াত হন ১৮৭২ সালেই। কাব্যটি ১৮৭২-এর মধ্যে লিখিত, আর সে-কারণেই শেষ মুখ্য উদাহরণ হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে থুইলারের মানচিত্রের সালটিকে।

প্রাক্কথনে বেশি-কিছু বলা নিরর্থক, কেন-না বইয়ের মধ্যেই বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র উদাহরণ, তথ্য ও উপাদান। তারপরও, অধ্যায়গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া জরুরি। মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে, 'প্রস্তুতিপর্ব' হিসেবে কয়েকটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। রয়েছে ভাগীরথীর প্রবাহপথ, হুগলি নদীর 'জন্মকথা', উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক দু-চারকথা। সেইসঙ্গে, এতদঞ্চলের প্রধান নদী-তীরবর্তী জনপদগুলিও আলোচিত হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে। রয়েছে আদিগঙ্গার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমাদের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'বাংলার কাব্যে দুই জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ'। ভূমিকা হিসেবে রয়েছে মঙ্গলকাব্যের বাণিজ্যযাত্রা-সংক্রান্ত একটি প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ, তারপরে মূল আলোচনায় প্রবেশ। পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত তেরোটি কাব্যে উল্লিখিত ত্রিবেণী -কলকাতা যাত্রাপথ ও গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদগুলিই এর উপজীব্য। *মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল*-এর মতো মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যমঙ্গল* ইত্যাদি বৈষ্ণব সাহিত্যও বাদ পড়েনি। রয়েছে *গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী*-র মতো গঙ্গামঙ্গল কাব্য, এমনকী দুটি *সত্যনারায়ণের পাঁচালি*-ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ-অধ্যায়ে। মূল তেরোটি কাব্য-আলোচনার বাইরেও, রইল দশটি কাব্যের গৌণ আলোচনা, যেগুলিতে আলোচ্য পথের আভাস চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়টি সম্পূর্ণভাবেই মানচিত্র-কেন্দ্রিক। বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য মানচিত্র হিসেবে ঐতিহাসিকরা ১৫৫০ সালে জ্যাও ডি ব্যারোজের আঁকা মানচিত্রটিকে চিহ্নিত করে থাকেন। আমাদের আলোচনাও শুরু হয়েছে সেই মানচিত্রটিকে কেন্দ্র করেই। ব্যারোজ ছিলেন জাতিতে পর্তুগিজ। ব্যারোজের পর, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফ্লেমিশ-সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির মানচিত্রকারদের আঁকা ১১টি মানচিত্র বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। বাদ পড়েনি ইংরেজদের পাইলট সার্ভিসের জন্য আঁকা নকশা, এমনকী রেনেলের বিখ্যাত মানচিত্রও। ১৮৪১ সালে আঁকা চার্লস জোসেফের ব্যান্ডেল থেকে গার্ডেনরিচ পর্যন্ত ভূ-সাংস্থানিক মানচিত্রটি আমাদের ভৌগোলিক গণ্ডির অনুসারী এবং উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সবচেয়ে নিঁখুত মানচিত্রও বটে। দুর্লভ এই মানচিত্রটি বিস্তৃতাকারে সংযোজিত হল বইয়ের সঙ্গে। রইল উনবিংশ শতকের রেলপথ-কেন্দ্রিক দুটি মানচিত্র ও তৎসংক্রান্ত আলোচনাও, যা উনিশ শতকের যোগাযোগ-ব্যবস্থার বিবর্তনের অন্যতম উদাহরণ।

পাশাপাশি, সাতটি 'গৌণ' মানচিত্রও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে এই পর্বে।

চতুর্থ অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত; মূলত আগের দুই অধ্যায়ের সারাংশ। একটি নির্দিষ্ট পথ বা অঞ্চল কাব্যে ও মানচিত্রে কীভাবে ধরা দিয়েছে, তার তুলনামূলক আলোচনা। আমরা খেয়াল করেছি, কাব্য ও মানচিত্র উভয়ের সময়কাল উপরিপাতিত হয়েছে প্রায়শই। এই সংযোগ সত্ত্বেও, জনপদগুলির প্রতি বাঙালি ও ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও গুরুত্বের যথেষ্ট ফারাক দেখা যায়। দীর্ঘ চারটি শতক জুড়ে পাশাপাশি চলার পরও, মৌলিক কিছু ফারাক থেকে গিয়েছে কাব্য ও মানচিত্রের বর্ণনার মধ্যে। এই অধ্যায় আলোকপাত করে সে-সমস্ত বিষয়ের ওপরেই।

'পরিশিষ্ট' অংশে রইল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে লন্ডনের *দ্য জেন্টলম্যান'স ম্যাগাজিন*-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ, যাতে গঙ্গা-তীরবর্তী বেশ-কিছু অঞ্চলের তৎকালীন রূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত হল যদুনাথ সর্বাধিকারীর *তীর্থ-ভ্রমণ* ও স্বামী বিবেকানন্দের *পরিব্রাজক* বই থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ। চিত্রবিভাগে রয়েছে বেশ কিছু পুথির পৃষ্ঠা, আলোচ্য মানচিত্রগুলির সম্পূর্ণ রূপ ও ইউরোপীয়দের তুলিতে-ক্যামেরায় নদী-তীরবর্তী বিভিন্ন স্থান ও স্থাপত্যের ছবি।

কাব্য ও মানচিত্র—উভয় ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক অংশটুকুই নির্বাচন করা হয়েছে। সার্বিকভাবে কোনো কাব্য ও মানচিত্রের প্রতি আলোকপাত আশা করা অনুচিত। আমাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট—উল্লিখিত দু-জেলার জনপদগুলিকে চিহ্নিত করা; ব্যতিক্রমী ও বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়লে, তা নিয়ে আলোচনা করা।

আলোচ্য কাব্য ও মানচিত্রগুলির বাইরেও বিভিন্ন প্রাচীন নথিতে গঙ্গা-তীরবর্তী এক বা একাধিক জনপদের উল্লেখ রয়েছে। সেইসব নথিপত্র কখনো কোনো কাব্য-কড়চা, কখনো ইউরোপীয়দের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত, কখনো আবার সরকারি কাগজপত্র। তবে, সেগুলিতে নদী ধরে এগিয়ে চলা ও দু-পাশের জনপদ-বর্ণনা নেই, বরং রয়েছে বিক্ষিপ্ত কিছু জনপদের নামোল্লেখ, কোথাও-বা তৎসংক্রান্ত আলোচনা। প্রাচীন নথি ও গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ—এই দুই শর্ত মিলে যাওয়া সত্ত্বেও সেগুলিকে সরিয়ে রাখা হল; কেন-না আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল চলমান বর্ণনার আভাস জিইয়ে রাখা; নদীপথে যাত্রার অভিজ্ঞতাটুকু গবেষণার মাধ্যমে বুঝে নিতে চাওয়া। ফলে, সচেতনভাবেই সেইসব নথিপত্র উঠে আসেনি আলোচনায়। তারপরও যে অংশটুকু রইল, তার গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো জনপদ চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত নথি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তুলে ধরা হল সেগুলিই। অবশ্য, অস্পষ্ট অতীতের ওপর ভর-দেওয়া কাজ ঘিরে সংশয় থেকেই যায়। হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাব্য ও মানচিত্র বাদ থেকে গেল। হয়তো ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনীন নয়। সন-তারিখ নিয়ে একাধিক মত ও বিতর্ক তো রয়েইছে। এসব প্রতিকূলতা মেনেই এগোতে হয়েছে আমাদের। ভুল-ত্রুটি কিছু থাকলে, পরবর্তীতে যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা থাকবে।

দীর্ঘ গবেষণামূলক এই কাজটির জন্য বহু মানুষের ঋণ অপরিশোধ্য। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায়, এ-বইয়ের ভূমিকা লেখার পাশাপাশি অজস্র পরামর্শ দিয়ে

সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অনিতেশ চক্রবর্তী, সজল ঘোষ, সুস্নাত চৌধুরী, সুপ্রতিম কর্মকার, বিশ্বজিৎ রায় (পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক), গৈরিক গঙ্গোপাধ্যায়, কৌশিক মজুমদার, সুকল্প চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত রায়চৌধুরী, অনুপ কুমার সাঁতরা, জিতেন্দ্রনাথ পতি, আত্রেয়ী চক্রবর্তী, রোদ্দুর মিত্র, পৃথ্বী বসু, তীর্থেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎসব চৌধুরী, সুপর্ণা ভট্টাচার্য, অর্ঘ্যকমল পাত্র, বাপ্পাদিত্য দাস প্রমুখের সাহায্য, পরামর্শ ও উৎসাহ আমাদের ঋদ্ধ করেছে। এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রভবন'-কে প্রাসঙ্গিক পুথির আলোকচিত্র ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। শেষে রইল সেইসমস্ত বইয়ের তালিকা, যেগুলি ছাড়া এ-কাজ সম্পূর্ণ হত না। প্রচ্ছদ করেছেন বন্ধু আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশকও তিনিই; তাঁর *মাস্তুল* প্রকাশনার তরফে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আপাতত এটুকুই। এবার তরী ভাসানোর পালা...

তন্ময় ভট্টাচার্য
tanmoyb39@gmail.com
+91 9674411671

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তুতিপর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

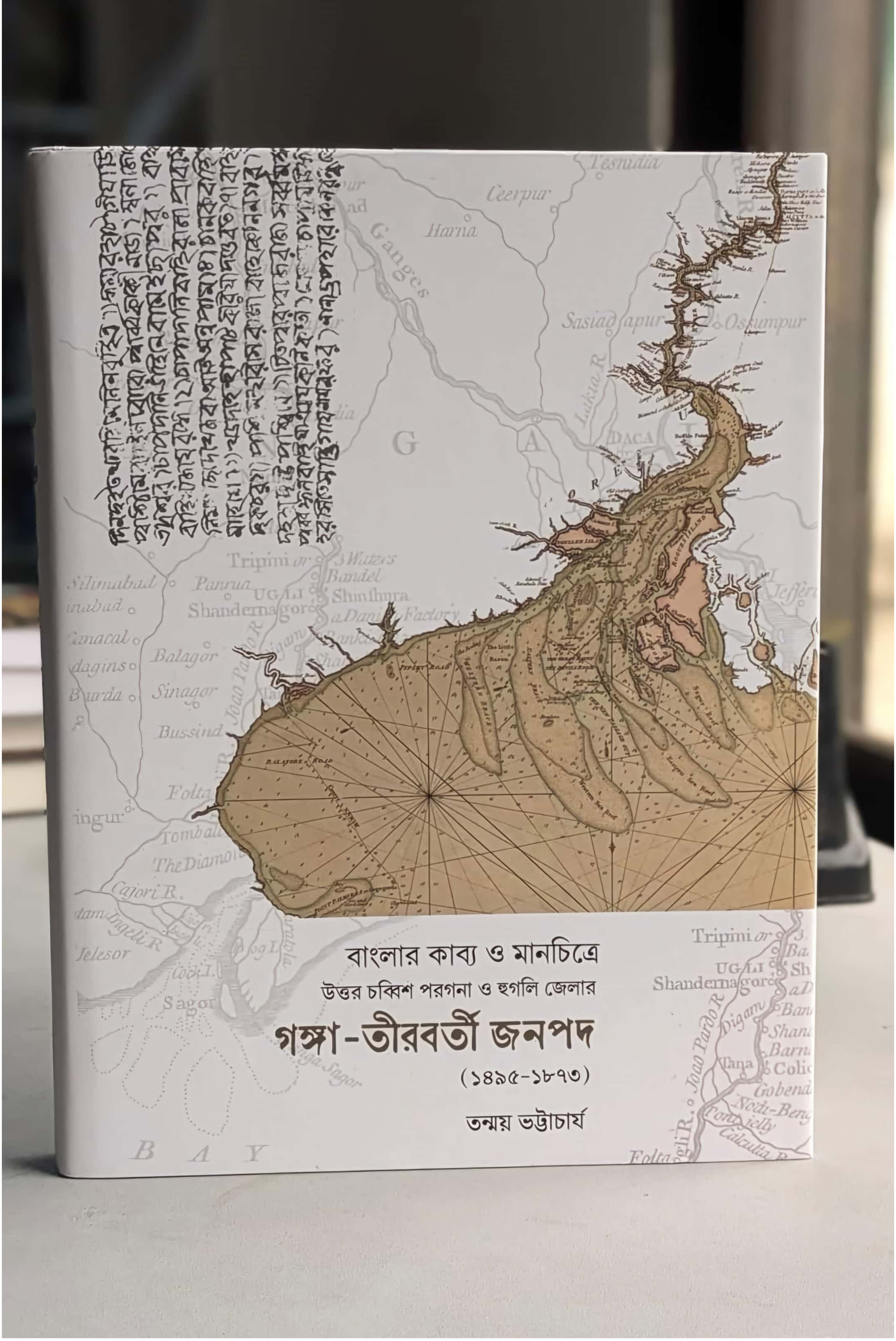
কাব্যে দুই জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ

চিত্রসূচি

তৃতীয় পর্ব: মানচিত্র (পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৬ মধ্যবর্তী)

চতুর্থ পর্ব: অঙ্কনচিত্র ও আলোকচিত্র (পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩ মধ্যবর্তী)

এ-বই এক টাইমমেশিন, যা আপনাকে নিয়ে যাবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তারপর, পাঁচটি শতকের জলপথে যাতায়াত করবেন আপনি, দেখবেন, কীভাবে বদলে যাচ্ছে দু-পাড়ের এলাকাগুলি। পথনির্দেশক হিসেবে হাতে থাকবে একাধিক বাংলা কাব্য, সঙ্গে ইউরোপীয়দের আঁকা বিভিন্ন মানচিত্র। মনে-মনে বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করবেন অতীতের। হুগলি জেলার ত্রিবেণী থেকে উত্তরপাড়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহর থেকে বরানগর—গঙ্গার তীর-ঘেঁষা জনপদগুলিই এই বইয়ের মেরুদণ্ড। প্রসঙ্গ অনুসারে, বিভিন্ন সময়ে গুরুত্ব পেয়েছে হাওড়া, কলকাতা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলও।


বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে
উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার
গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ
(১৪৯৫-১৮৭৩)
তন্ময় ভট্টাচার্য